ঈর্ষা: পুরুষালী অহং ও শারীরিকতার ধারণার নিরিখে নারী চরিত্রের প্রতিরূপায়ণ

উম্মে সুমাইয়া*

সারসংক্ষেপ

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক রচিত *ঈর্ষা* নাটকে একটি শক্তিশালী নারী এবং দুইজন পুরুষ চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে। যাদের ঘিরেই এই নাটকের কাহিনী নির্মিত হয়। দুইজন পুরুষ চরিত্র যেন বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সাংস্কৃতিক চর্চায় নিযুক্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণির চোখ দিয়ে দেখার কারণ হলো নাটকের কাল্পনিক গঠন, যেমন দুইজন পুরুষের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে নারী চরিত্রটি নির্মিত হয়েছে। দুজন পুরুষের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে নারীর অবস্থান এবং তাদের মূল্যায়ন পরিপ্রেক্ষিত বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নারী চরিত্রের সংলাপ, অন্যান্য চরিত্রের সংলাপ, চরিত্রগুলো বিশেষ পরিস্থিতিতে কী ক্রিয়া করছে, কী আচরণ করছে, তাদের পরিণতি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করার মধ্যদিয়ে *ঈর্ষা* নাটকটির নারী চরিত্রের উপস্থাপন পদ্ধতি যাচাই করা হয়েছে। সংলাপ এবং ভাষার মধ্যদিয়ে নারী চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, সামাজিক ভূমিকা, নৈতিকতা এবং নারীর শরীর কীভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে তা আলোচনা করা হয়েছে।

ঈর্ষা তিন চরিত্রের একটি কাব্য নাটক। সংলাপ সংখ্যা সাত। "তিনটি চরিত্র আর তাদের দীর্ঘ সাতটি সংলাপে বয়ন করা হয়েছে এই নাটকের বস্ত্র" (হক, ১৯৯১: ২৮৫)। সংলাপ দীর্ঘ কিন্তু নাট্যকারের চরিত্র উপস্থাপনের তীক্ষ্ণতা নাটককে টানটান করে রাখে। নাটকের ঘটনা নির্মিত হয় একজন প্রবীণ চিত্রকলা শিক্ষক এবং অন্য দুজন তরুণ-তরুণী চিত্রকলার শিক্ষার্থী, নাটকে তাদের নাম যুবক এবং যুবতী। যুবতী শিল্পচর্চা করতে এসে শিক্ষকের প্রেমে পড়ে। প্রৌঢ় যুবতীকে মূর্ত শিল্প শিক্ষাদানে আগ্রহী হয়ে দুজনই দৈহিক কামনা-বাসনায় জড়িয়ে পড়ে। সৈয়দ জামিল আহমেদ (২০১৪: ১৬০) 'বাঁচনের নকশা' কীভাবে বাংলাদেশের সমকালীন থিয়েটারে অঙ্কিত হয়েছে এর এক সবিস্তার গবেষণা করেছেন। তিনভাগে বিভক্ত এই গবেষণায়

* প্রভাষক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'Designs gender: replications and transgressions' নামক অংশটিতে বাংলাদেশের থিয়েটারে নারী চরিত্র এবং জেন্ডার ধারণা কীভাবে সৃজিত, কীভাবে উপস্থাপিত তা ক্রিটিক্যালি আলোচিত হয়েছে। তিনি ১৯৬১ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের থিয়েটারে 'নারী প্রশ্ন' কীভাবে উত্থাপিত হয়েছে তার একটা চিত্র এই লেখায় তুলে ধরেন। তাঁর গবেষণায় *ঈর্ষা* সম্পর্কে বিশ্লেষণী মন্তব্যে বলেছেন, "তিন চরিত্রের ত্রিভুজ প্রেমের দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিক সংকটকে কেন্দ্র করে সুদীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে রচিত *ঈর্ষা* মানব মনের অতলে আলো-অন্ধকারে বাসাবাধা চোরাগলির এক ভয়াবহ প্রতিবিম্ব" (আহমেদ, ১৯৯৫: ৮১)। নাটকটি শুরু হয় একটা দ্বন্দ্ব থেকে, একটা উত্তেজনা থেকে। একজন নারীকে নিয়ে দুজন পুরুষের সম্পর্কের জটিল এক অবস্থা থেকে নাটকের যবনিকা উঠে। এই নাটকের মধ্য দিয়ে সৈয়দ হক ঈর্ষার মানবিক রূপ তুলে ধরতে চেয়েছেন। যেখানে-

> ঈর্ষা হয় এক বিস্ময়কর পরিস্থিতি; ঈর্ষা হয় একই সঙ্গে পাশবিক ও মানবিক একটি অনুভূতির সাধারণ নাম যার মূল ক্ষেত্র প্রেম কিম্বা দেহ-সংসর্গ; হয় বিস্ময়কর, মানবের বেলায়, এ কারণে যে, যে-মানুষ নিজের সীমা ও ভর সম্পর্কে সচেতন থেকে জীবনের অপর সকল প্রসঙ্গে আজীবন ঈর্ষাহীন, প্রেম বা দেহ-সংসর্গের অনুষ্ঠানে সেই মানুষটিই নিজেকে হতে দেয় ঈর্ষাদষ্ট, পূর্বের আত্মচেতনা প্রয়োগ করতে সে হয় বিস্মৃত। (হক, ১৯৯১: ২৮৪)

নাট্যকার কোনো চমক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয় বরং সীমিত চরিত্র ও বয়নবদ্ধ দীর্ঘ সংলাপের মধ্য দিয়ে ঈর্ষার প্রকৃতরূপ তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি বলেন,

> ঈর্ষা আমি দীর্ঘকাল অবলোকন করেছি, দীর্ঘদিন এর সঙ্গে ঘরবাস করেছি; জীবনের সকল প্রসঙ্গের ভেতরে প্রেম ও দেহ সংসর্গে স্থাপিত ঈর্ষাই আমার কাছে একমাত্র গ্রাহ্য হয়েছে। শিল্পে আমি ঈর্ষাকে যখন স্মরণ করি, অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায়, এবং আমার মতো অনেকেরই নিশ্চয়, শেকসপীয়রের 'অথেলো' – ঈর্ষার নির্যাস নিয়ে এর চেয়ে অক্ষয় রচনা আমার আর জানা নেই। কিন্তু সেখানেও একদিন আমি আবিষ্কার করি যে, অথেলোর ঈর্ষা এমন ঈর্ষা নয় যা সম্পূর্ণ মানবিক, সৎ অর্থে 'পশু' শব্দটি ব্যবহার করে বলতে পারি পশুদের ভেতরেও মোটা দাগে অথেলো-র প্রায় অনুরূপ ঈর্ষা এবং পরিণামে হত্যা-সংঘটন দুর্লক্ষ্য নয়। অচিরেই আমার এ সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে আমি অগ্রসর হই এবং অনুসন্ধান করতে থাকি ঈর্ষার এমন কোন রূপ আছে যা কেবল মানবের ভেতরেই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। (হক, ১৯৯১: ২৮৪)

গভীর জীবনবোধ এবং ব্যতিক্রমী নাটকীয় উপকরণে নির্মিত এই নাটক। যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার মনোজগতের এক স্বচ্ছ চিত্র উপস্থাপিত হয়।

(১)

নাটকের শুরুতে প্রৌঢ় যুবতীর শরীরের রূপ বর্ণনা করে, সেখানে নারী যেন এক নিষ্ক্রিয় সৌন্দর্য, যা বাংলার প্রকৃতির মতন রূপসী কিন্তু এখানে নারী হিসেবে যুবতী ভোগ্য। এমনকি নাট্যকারের 'যুবতী' চরিত্র নামকরণের মধ্যেও যৌবন মুখ্য।

> বেলা থাকতে ফিরে আসি, সে রাতেই আমি আঁকি তোমার প্রথম ন্যুড? কি বিষণ্ন দেখাচ্ছিল সে রাতে তোমাকে, কি আশ্চর্য আভা ছিল তোমার শরীরে, জগতের সমস্ত সিঁদুর যেন উপুড় হয়ে ঢেলেছে কেউ, শাড়ি অংগে সেই, ছেড়ে ফেলেছিলে শাড়ি, কিন্তু তবু শাড়িটির রঙ তুমি ছাড়তে পারোনি। মনে পড়ে? না, উঠবে না। – যাবে না। – চলে গেলেই কি সব চলে যায়? মুছে যায় ক্যানভাস? মুছে যাবে তোমার সমস্ত ন্যুড? নগ্ন ঐ শরীরের সমস্ত রঙ? স্তন, পিঠ, নিতম্ব, কোমর? ... ঐতো পাশের ঘরে, স্টুডিওতে আছে সেই আসন যেখানে নগ্ন হয়ে তুমি বসেছিলে, আছে সে ডিভান যেখানে হেলান দিয়ে, হাত ফেলে সিটিং দিয়েছো, তারপর ঈষৎ নেমেই নিতম্বের আশ্চর্য উত্থান, তারপর কোমল বৃক্ষের যেন ছোট দুটি ডাল, তোমার পা। (হক, ১৯৯১: ২৯০–২৯১)

এ নাটকে যৌনতা এমন একটি লক্ষণ যার মাধ্যমে সাধারণভাবে বাঙালি পুরুষের মন উন্মোচিত হয়। নারীদেহের ওপর পুরুষের অবিরাম জয়ের চেষ্টা নির্দিষ্টভাবে চিত্রিত হয়। প্রৌঢ় যুবতীর নগ্ন শরীর ক্যানভাসে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে নারীকে চূড়ান্তভাবে শরীর সর্বস্ব করে তোলেন। যেখানে আর্টিস্ট মানে সক্রিয় পুরুষ, অর্থাৎ সমাজের অধিপত্তশীল শক্তি, আর নারীর মডেল মানেই দ্রষ্টব্য। নারী বুদ্ধির চেয়ে দেহ সর্বস্ব হয়ে ওঠে, যেখানে দেহ দেখে এর সম্পর্কে ভাষ্য উৎপাদন করছে পুরুষ। এখানে নারীকে পোশাকহীন করার মধ্যদিয়ে দুইটা ব্যাপার কাজ করে– একদিকে প্রৌঢ়ের শিল্পী সত্তা (যিনি নিতান্তই একজন চিত্রকলা শিল্পী এবং শিক্ষক), আরেকদিকে তার একেবারেই জৈব সত্তার (যেখানে প্রৌঢ় পুরুষ এবং প্রেমিক) প্রকাশ ঘটে। নাট্যকার প্রৌঢ় চরিত্র উপস্থাপনায় এই দুই সত্তার একটা মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। প্রৌঢ়ের ন্যুড আঁকার মধ্যদিয়ে বাস্তব নারী ক্যানভাসে রূপায়িত হয়। নারীকে ক্যানভাসে রূপায়িত করেছে একটা সৌন্দর্যের আঁকর হিসেবে, যেখানে পুরুষতান্ত্রিক শিল্পের নমুনা পাওয়া যায়। পুরুষতান্ত্রিক শিল্পের অন্যতম বিষয়বস্তু হলো নারী; শুধু নারী নয়, নারীর নগ্নতা এবং 'নগ্নতার মধ্যে সৌন্দর্য' আছে– এ ধরনের একটা বক্তব্য পাওয়া যায়। "বস্ত্রপরিহিত ও অলঙ্কৃত নারীর মধ্যে প্রকৃতি উপস্থিত থাকে, তবে নিয়ন্ত্রিতভাবে, মানুষের ইচ্ছে দিয়ে তাকে ঢালাই করা হয় পুরুষের কামনা অনুসারে। কোনো নারীর মধ্যে প্রকৃতি যতোবেশি বিকশিত ও বন্দী হয়, সে ততোবেশি হয়ে ওঠে কামনার বস্তু" (বোভোয়ার, ২০১৯: ১৩৯)।

নারীকে ঢাকনাহীন করা, বস্ত্রহীন করার মধ্যে নারীর নির্যাস নারীর মন নয়, বরং নারীর দেহ। যে দেহকে রক্ত মাংসে ধরা যায়, আলিঙ্গন করা যায়, চুম্বন করা যায়। একদিকে নারী এখানে শিল্পের বিষয়বস্তু, আবার নারী ভোগের বিষয়বস্তু। প্রৌঢ় চরিত্রের প্রথম সংলাপে শিল্পীর এমন এক পুরুষ সত্তা উপস্থাপিত হয় যেখানে সে শুনছে "আমি (যুবতী) বিয়ে করেছি আজকে" (হক, ১৯৯১: ২৮৮)। এখানে যুবতী তার সাথে বিয়েহীন সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল এবং আজকে বিয়ের মধ্যদিয়ে যুবকের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। ফলে দেখা যায়, শিল্পীর পুরুষ হিসেবে একটা যে স্বাধীন অবারিত মন আছে, এই মনের চাওয়ার সামগ্রী বা বস্তু হিসেবে যুবতীকে আর ফিরে পাবে না বলে পৌঢ় ক্রুদ্ধ হয়ে যায়।

> পরস্পরবিরোধী রীতিতে সে [পৌঢ়] অভিকাঙ্ক্ষী হয় জীবন ও বিশ্রাম, অস্তিত্ব ও নিতান্ত জীবনধারণ উভয়েরই; সে ভালোভাবেই জানে যে 'আত্মার ঝঞ্ঝাট' হচ্ছে বিকাশের দাম, জানে যে অভীষ্ট বস্তু থেকে দূরত্ব হচ্ছে তার নিজের কাছে নৈকট্যের মূল্য; তবে সে স্বপ্ন দেখে উদ্বেগের মধ্যে শান্তির এবং এক অনচ্ছ পরিপূর্ণতার, যা ভূষিত থাকবে চৈতন্যে। এ স্বপ্নের সম্যক প্রতিমূর্তি নারী; সে প্রকৃতির সাথে আকাঙ্ক্ষিত যোগাযোগের মাধ্যম, পুরুষের কাছে অপরিচিত, এবং সহচর সত্তা, যে অত্যন্ত অভিন্ন। প্রকৃতির বিরূপ নৈঃশব্দ দিয়েও সে পুরুষের বিরোধিতা করে না, আবার পারস্পরিক সম্পর্কের কঠোর আবশ্যকতা দিয়েও বিরোধিতা করে না; এক অনন্য বিশেষাধিকারের মাধ্যমে সে এক চৈতন্যসম্পন্ন সত্তা এবং তবুও মনে হয় যেনো তাকে শারীরিকভাবে অধিকার করা সম্ভব। (বোভোয়ার, ২০১৯: ১২৪)

যেহেতু সেই শরীরে প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার আজ থেকে তার আর নেই, ফলে এখানে নারীকে না পাওয়ার ক্ষেত্রে সে একটা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। এখন তার সামনে প্রতিদ্বন্দ্বী আবির্ভূত হয়, কিন্তু এর চেয়ে যুবতীকে আর শারীরিকভাবে না পাওয়াটা বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রৌঢ় শিল্পী হিসেবে যুবতীর সাথে যে সম্পর্ক, সেই প্রেমের সম্পর্ককে একটা মুক্ত সম্পর্ক হিসেবে সে বিশেষ ভাবতে পারতো, কিন্তু সেটা আর ভাবতে পারছে না। ফলে এখানে পুরুষের অহং বড় হয়ে উঠে। যা শিল্পীর অহং নয়, পুরুষেরই অহং।

> পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার আদিকাল থেকে তারা [পুরুষ] নারীকে পরনির্ভর অবস্থায় রাখাকে মনে করেছে সবেচেয়ে ভালো; তাদের আইনগত বিধিবিধান তৈরি হয়েছে নারীর বিরুদ্ধে; এবং এভাবে তাকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। [...] অন্যান্য পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিটি পুরুষকে ছিন্ন ক'রে আনে তার সীমাবদ্ধতা থেকে এবং তাকে সমর্থ করে তার সত্তার সত্যতাকে পূর্ণ ক'রে তুলতে, সীমাতিক্রমণতার মধ্যে দিয়ে, কোনো লক্ষ্যের দিকে যাত্রার মধ্য দিয়ে, কর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ করতে। তবে এ-স্বাধীনতা আমার [নারীর]

> নিজের নয়, আমার স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়েও এটি তার বিরোধিতা করে : হতভাগ্য মানব চৈতন্যের ট্র্যাজেডি এখানেই; প্রতিটি সচেতন সত্তা শুধু একলা নিজেকে সার্বভৌম কর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করার অভিকাঙ্ক্ষী। অপরকে দাসে পরিণত ক'রে প্রত্যেকে পরিপূর্ণ করতে চায় নিজেকে। (বোভোয়ার, ২০১৯: ১২৩-১২৪)

ফলে পুরুষতন্ত্রের যে ভাবাদর্শ, সেটাই সৈয়দ হক এর চরিত্র রূপায়ণে কার্যকর।

(২)

> যৌবন বলতে আপনি বোঝাতে চেয়েছেন শরীরের বিশেষ অংগকে। এতটুকু আশ্চর্য নই এবং অস্বীকার করবো না যে, এই শরীর আপনার প্রৌঢ় শরীরে প্রথমবারের মতো জ্বেলে দিয়েছিল কামনার আগুন যাতে দেহ পুড়বে না, কিন্তু পুড়ে যাবে এক কুমারীর নাভি। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমিও আপনার মতো শিল্পী হতে চাই, মডেল বা রক্ষিতা নয় কোনো শিল্পীর, তা শিল্পী সে আপনি বা আর কেউ হোন। (হক, ১৯৯১: ২৯৭)

যুবতীর এই সংলাপের মাধ্যমে শামসুল হক নারীর এক আলাদা সত্তা হয়ে উঠতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছেন। যেখানে তার প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় নারীর নিজের শরীর। শরীরের ডাকে সাড়া দেয়াতে নারীর স্বপ্ন হারিয়ে যায়। যুবতী মেয়েটি শরীর সর্বস্বতার বাইরে কথা বলতে চায়। কারণ "নারী ততোখানি নারী যতোখানি সে নিজেকে নারী মনে করে। [...] প্রকৃতি নারীকে সংজ্ঞায়িত করে না; তার আবেগগত জীবনে প্রকৃতির সাথে নিজের মতো ক'রে কাজ করতে গিয়ে সে নিজেই সংজ্ঞায়িত করে নিজেকে" (বোভোয়ার, ২০১৯: ৫৩)। যুবতীর সংলাপের মধ্যে দেখা যায় শিল্পেরও যৌবন থাকতে পারে, যা তার সৃজনশীল সত্তাকে বড় করতে পারে। যুবতী এমনভাবে নির্মিত চরিত্র যার শিল্প সৃজনের তীব্র আকুতি আছে। যুবতী এখানে শিল্পের বাসনায় উন্মুখ। তার যে ভালোলাগা, তার যে চির বাসনা, আকাঙ্ক্ষা সেটা পূর্ণ করার জন্য একটা শিক্ষা বা দীক্ষার প্রয়োজনে প্রৌঢ়ের সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হয়। "নারী হিসেবে সে যদি জীবনে সফল হ'তে চায়, তাহলে তাকে সুখী করতে হবে একটি পুরুষকে" (বোভোয়ার, ২০১৯: ৩৭২)। "প্রত্যেক সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনোদৈহিক আলামতই সংগঠিত হয়, গ্রথিত হয় অজস্র গতিপ্রবাহ দ্বারা যেগুলো বিভঙ্গ, ধারাবাহিকতাহীন ও উদ্দেশ্যহীন, অন্তর্গতভাবে যেগুলো তাদের ইতিহাসকে বহন করে এবং যার কোনোটিই আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়" (স্পিভাক, ১৯৯০: ১২০)। যুবতীর সংলাপে উপস্থাপিত হয়– শরীরই শেষ কথা নয়, বরং সৃষ্টিও বড় কথা হতে পারে। ফলে এখানে এমন এক নারীর উপস্থাপন রয়েছে যে শরীরিকতার উর্ধ্বে সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় বিশেষ হয়ে উঠেছে।

> নারীর যে শরীর গাভীর রাঙের মতো বাজারে বিকোয়, সেই বিদ্যা আজ আপনি শেখান আমাকে। আয়নায় তখন দেখতেন যদি আপনাকে আপনি নিজেই, দেখতেন– কি অনুপ্রাণিত ভঙ্গীতে আপনার হাতের আঙুল বর্ণনা করছে কারো 'নিতম্বের আশ্চর্য উত্থান। (হক, ১৯৯১: ৩০২)

এই সংলাপের মধ্যদিয়ে যুবতী শিক্ষকের, প্রৌঢ়ের বা শিল্পীর মনোবিশ্লেষণে বিবৃত হয়। তারমানে এখানে এক বিশ্লেষণক্ষম নারীকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কেবল সে আত্মবিশ্লেষণই করতে পারছে তাই নয়, বরং অপর পুরুষের মন বিশ্লেষণ করছে। এর মধ্যদিয়ে সে সমাজের মন বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হয়। ফলে এক বিশ্লেষণক্ষম স্বাধীন চিন্তা শক্তির অধিকারী নারী রূপায়িত হয়।

> আমি বিষয় ছিলাম, ব্যক্তি নই আপনার কাছে। আমাকে সন্ধান নয়, সন্ধান করেছেন আমার ভেতরে আপনি আঁকার বস্তুকে– টিউবের ঠাণ্ডা নীল, হিম লাল, বরফ সবুজ, কীভাবে কেমন করে কিসের উত্তাপে জ্বল জ্বল করে উঠবে, আপনি সেই রসায়ন খুঁজেছেন আমার শরীরে। আমার হৃদয়ে নয়, আমার শরীরে, শরীরে, শরীরে শুধু, শরীরের ত্বকে– ত্বকের গভীরে নয় মাংসের উত্তান পতনে, মেদময় স্তনে ও নিতম্বে, আমার ত্রিভুজের সন্ধান করেছেন আপনারই শিল্প প্রতিভাকে। (হক, ১৯৯১: ৩০২)

যুবতী প্রৌঢ়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে শরীর দিয়ে। নারী শরীরের উত্থান-পতন প্রৌঢ়ের শিল্প পিপাসাকে গাঢ় করে। ফলে নারীর শরীর হয়ে ওঠে ক্যানভাসের প্রতিচ্ছবির উৎস এবং উপকরণ। 'আমার হৃদয়ে নয়, আমার শরীরে, শরীরে, শরীরে শুধু–আপনারই শিল্প প্রতিভাকে' এই কথা বলার মধ্যদিয়ে যুবতীর বিশ্লেষণ কিছুটা খণ্ডিত হয়ে যায়। নারীত্বের কণ্ঠস্বর প্রকাশ পেয়েও দ্বন্দ্ব আক্রান্ত হয়ে সবল আত্মপ্রকাশ দুর্বল হয়ে ওঠে। সবল আত্মপ্রকাশে ব্যাঘাত ঘটে যুবতীর এই ভাবনার মধ্যদিয়ে। প্রৌঢ়ের সংলাপে সে নারীকে একই সঙ্গে শিল্পের উপকরণ হিসেবে দেখছে আবার তার কামনার বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে নারীর শরীরকে দেখছে। কিন্তু কামনার বিচরণক্ষেত্র হিসেবে নারীকে দেখার মন যে প্রৌঢ়ের আছে সেটা যুবতীর বিশ্লেষণে প্রকাশ পায় না। যুবতীর নিজের যে কণ্ঠস্বর সেটা স্পষ্ট হলেও, তার বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটলেও, স্বাধীন চিন্তা শক্তির অধিকার থাকলেও, সেই স্বাধীন চিন্তাশক্তির মধ্যেও ঘাটতি রয়ে গেছে।

(৩)

যুবকের সংলাপে দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পুরুষ যেভাবে বিদ্রোহের স্ফূর্তি অনুভব করে, বিদ্রোহের প্রেরণা লাভ করে, সেই বিদ্রোহের প্রেরণার উৎস হিসেবে নারীকে দেখছে। নারী নিজে বিদ্রোহী নয়, পুরুষের বিদ্রোহের উৎস হিসেবে নারী রূপায়িত

হচ্ছে। যুবকের কথার মধ্যে দেখি এক নিষ্ক্রিয় নারী সত্তার নির্মাণ। যে নির্মাণে নারী বিদ্রোহীনি নয়, বরং পুরুষের বিদ্রোহের আধার।

> এটা স্পষ্ট যে পুরুষ নিজেকে দাতা, মুক্তিদাতা, ত্রাতা, পাপমোচনকারীরূপে স্বপ্ন দেখে কামনা করে তার কাছে নারীর অধীনতা; কেননা নিদ্রিতা রূপসীকে জাগানোর জন্যে তাকে আগে ঘুম পড়ানো দরকার। [...] নারীর কেনো রয়েছে এক দ্বৈত ও প্রতারক মুখাবয়ব, তার কারণ এ-ই : পুরুষ যা কিছু কামনা করে, সে তা এবং পুরুষ যা কিছু অর্জন করতে পারে না, সে তা। [...] পুরুষ যা কামনা করে ও যা ভয় করে, পুরুষ যা ভালোবাসে ও যা ঘৃণা করে, সেসব পুরুষ প্রক্ষেপ করে নারীর ওপর। (বোভোয়ার, ২০১৯: ১৫২-১৬০)

আবার যুবকের সংলাপে নারী রূপায়িত হয় প্রকৃতির মতন, নারী হয়ে ওঠে মাতৃভূমি কারণ "The backgrounding and instrumentalisation of nature and that of women run closely parallel" (প্লামউড, ১৯৯৩: ২১) এবং "নারী হচ্ছে সেই সুবিধাপ্রাপ্ত বস্তু, যার মাধ্যমে পুরুষ পরাভূত করে প্রকৃতিকে [...] যৌন বিদ্ধকরণ পৃথিবীকে দৈহিকভাবে অধিকার করার একমাত্র রীতি নয়। [...] সমুদ্র ও পর্বত যদি হয় নারী, তাহলে নারীও তার প্রেমিকের কাছে সমুদ্র ও পর্বত" (বোভোয়ার, ২০১৯: ১৩৭)। "আমার দু'চোখে আমি তুমি ছাড়া কাউকে দেখিনি; বাংলার সবটুকু শ্যামলতা নিয়ে আমার হৃদয় জুড়ে ছিলে তুমি। তোমাকেই মনে হতো বাংলাদেশ; তুমি গর্ভবতী হবে, সন্তানের জন্ম দেবে" (হক, ১৯৯১: ৩১১)।

> স্বামী তার স্ত্রীকে শুধু কামগতভাবে 'গঠন' করে না, করে নৈতিক ও মননগতভাবেও; স্বামী তাকে শিক্ষা দেয়, তার মূল্যায়ন করে, তার ওপর মারে নিজের ছাপ। যেসমস্ত স্বপ্নে পুরুষ আনন্দ পায়, তার একটি হচ্ছে তার ইচ্ছেয় জিনিসপত্র রঞ্জিত করা– তাদের গঠনকে বিশেষ রূপ দিতে, তাদের উপাদানকে বিদ্ধ করতে। নারী হচ্ছে *সর্বোচ্চ মাত্রায়* 'তার হাতের কর্দম', যার ওপর নিষ্ক্রিয়ভাবে ক্রিয়া করা যায় এবং যাকে আকৃতি দেয়া যায়; আত্মসমর্পণ করতে করতে নারী বাধা দিতে থাকে, তার ফলে পুরুষের কাজ চলতে থাকে অনির্দিষ্ট কাল ধ'রে। (বোভোয়ার, ২০১৯: ১৪৯)

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রাক্কালে একজন মুক্তিযোদ্ধা যিনি নিজেও শিল্পী, সেও নারীকে দেখছে শিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে। তার এই শিল্পীর আকাঙ্ক্ষা আর এই রাষ্ট্রের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দুটি একসাথে মিলেমিশে আছে। এখানে যুবকের বিশিষ্টতার মধ্যে নারী হচ্ছে সদ্য স্বাধীন হবে এমন এক সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের প্রতীক। এক ধরনের রাজনৈতিক স্বপ্নের পরিপূরক হয়ে ওঠে নারী বা যুবতী। কিন্তু পরিপূরক হয়ে ওঠার মধ্যে আমরা নারীকে সক্রিয় হতে দেখি না। বারবার দেশ বা ভূমির সাথে নারী প্রতীকায়িত হচ্ছে। পরিবেশ নারীবাদী প্লামউড (১৯৯৩) বলেন–

> The dominant and ancient traditions connecting men with culture and women with nature [...] the dominant tradition of men as reason and women as nature [...] the very idea of a feminine connection with nature seems to many to be regressive and insulting, summoning up images of women as earth mothers, as passive, reproductive animals, contented cows immersed in the body and in the unreflective experiencing of life. (p. 20)

কারণ ভূমি হচ্ছে নিষ্ক্রিয় যাকে কৃষক চাষের মধ্যদিয়ে ফসল ফলাতে পারে, ফলে নারী গর্ভবতী হবে এটা পুরুষের মধ্যদিয়ে। নারীর এই যে গর্ভের অধিকার সেটাও পুরুষের হাতে নিয়ন্ত্রিত। এখানে নারী একান্তই নিষ্ক্রিয় এবং পুরুষ সক্রিয়, এভাবেই নারীর প্রতিরূপায়ণ হচ্ছে। 'তুমি গর্ভবতী হবে, সন্তানের জন্ম দেবে' এক উর্বর সম্ভাবনা যে নতুন শস্যের জন্ম দিতে পারে, সন্তানের জন্ম দিতে পারে এমন নারীর প্রতীকে উপস্থাপিত হচ্ছে যুবকের মাধ্যমে। এখানে যুবতীকে উপস্থাপন করছে এমন এক নারী হিসেবে যে নিজে বাংলাদেশ বদলাবার ভূমিকা নেয়নি বরং বাংলাদেশ বদলাতে ভূমিকা নিতে পারে এমন সন্তানের জন্ম দেয়ার উৎস হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

> পুরুষ নারীর মাধ্যমে উপভোগ করতে চায় যে সৌন্দর্য, উষ্ণতা, অন্তরঙ্গতা, সেগুলো আর শরীরী গুণাবলি নয়; বস্তুর অব্যবহিত ও উপভোগ্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করার বদলে নারী হয়ে ওঠে তাদের আত্মা; শরীরী রহস্যের থেকে গভীর, তার হৃদয়ে এক গোপন ও বিশুদ্ধ উপস্থিতি প্রতিফলিত করে বিশ্বের সত্য। সে গৃহের, পরিবারের, বাড়ির আত্মা। এবং সে নগর, রাষ্ট্র, জাতির মতো বৃহত্তর সংঘগুলোর আত্মা। ইয়ুং বলেছেন নগরকে সব সময়ই সম্পর্কিত করা হয়েছে মায়ের সাথে, কেননা তারা বক্ষে ধারণ করে নগরবাসীদের : তাই সিবিলেকে রূপায়িত করা হয় সৌধের মুকুটপরা মূর্তিতে। এবং এভাবে বলা হয় 'মাতৃভূমি' (বোভোয়ার, ২০১৯: ১৪৯)

আবার যুবক যখন বলে– "তোমাকে বলতে হবে, বিছানায় কতবার গিয়েছো ... ... *ঈর্ষা* করি আমি তাঁর প্যালেটকে, ব্রাশকে, *ঈর্ষা* করি ক্যানভাসকে তাঁর, কখনোই তাঁকে নয়, যদিও আমার নারীকে তিনি কেড়ে নিয়েছেন" (হক, ১৯৯১: ৩১২)। এই সংলাপে নারী বস্তু হয়ে উঠে। বয়সের দিক থেকে যে যৌবন পরিমাপযোগ্য তা এখানে প্রকাশ পায়। যুবকের *ঈর্ষা* প্রৌঢ়ের শিল্পী সত্তার প্রতি, শিল্পী সত্তার পারঙ্গমতার প্রতি। বয়সের মাপকাঠিতে যৌবন বিচার করে সে তবুও বলছে 'আমার নারীকে তিনি কেড়ে নিয়েছেন', এখানে প্রৌঢ়কে একজন লুটেরা হিসেবে চিহ্নিত করছে। 'আমার নারীকে', এখানে নারী এমন এক নিষ্ক্রিয় সত্তা যাকে পুরুষ শিল্পী তার শিল্পের স্পর্ধায় কেড়ে নিতে পারে, আর নইলে যুবক তার বয়সে তারুণ্যের স্পর্ধায় কেড়ে নিতে পারে। "পুরুষের

ঈর্ষা হচ্ছে নিতান্ত একান্তভাবে [নারীকে] অধিকারের ইচ্ছা"(বোভোয়ার, ২০১৯: ৩৬৬)। তারমানে হয় যৌবন দিয়ে, নাহয় শিল্পের মোহ দিয়ে নারীকে কেড়ে নেয়া যায়। "একটি নারীর সাথে সে সঙ্গম করেছে, একথা বলার জন্যে পুরুষ বলে যে সে নারীটিকে 'দখল' করেছে, বা সে তাকে 'পেয়েছে'" (বোভোয়ার, ২০১৯: ২২৮)। যুবকের "এই নারী আপনার" এই সংলাপের মধ্যদিয়ে তা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। কারণ এই পৃথিবী কখনওই নারীর ছিলো না।

> তার জন্মও স্বাধীন ছিলো না; বিধাতা তাকে তারই জন্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি করেনি এবং প্রতিদানরূপে সরাসরি তার উপাসনা লাভের জন্যও সৃষ্টি করেনি। সে তার নিয়তি নির্ধারণ করেছিলো পুরুষের জন্যে; আদমকে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্ত করার জন্যে সে হাওয়াকে দান করেছিলো আদমকে, তার সহচরের মধ্যেই ছিলো তার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য; হাওয়া ছিলো অপ্রয়োজনীয়দের বিন্যাসের মধ্যে আদমের পরিপূরক। তাই সে দেখা দেয় সুবিধাপ্রাপ্ত শিকারের বেশে। সে ছিলো চেতনার স্তরে উন্নীত প্রকৃতি; সে সচেতন সত্তা ছিলো, কিন্তু প্রাকৃতিকভাবেই ছিলো অনুগত। (বোভোয়ার, ২০১৯: ১২৫)

(৪)

শিল্পীর বা প্রৌঢ়ের মধ্যে এক ধরনের প্রায়শ্চিত্ত দেখা যায়, যেখানে সে মনে করে নারীকে ভোগ করেছে বলে নারী নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ প্রৌঢ় প্রেমকে মনে করছে সম্ভোগ। প্রৌঢ়ের প্রায়শ্চিত্তে শিল্পীর একটা নিজস্ব নীতিবোধ প্রকাশ পায়। যেখানে সে মনে করে সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যদিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব এবং নারীর একটা শুদ্ধতম রূপায়ণ সম্ভব। ফলে প্রেমকে সে শরীরের অপমান ভাবে, যেখানে শরীরের মধ্যদিয়ে একজন নারীর নষ্ট হওয়া না-হওয়া নির্ণীত হয়।

> হাত বাড়ালাম। কিন্তু সে আঁকার হাত, নিঃসঙ্গতার হাত। অসহায় হাত। ক্ষত বিক্ষত হাত। এই হাত। এই দুটি হাত। দেখতে পাচ্ছো? দ্যাখো, ভালো করে দ্যাখো, হাত। –তুমি বাড়াও তোমার হাত। একবার মিলিয়ে দ্যাখো। যুবক, এই হাত তোমারই হাত। তোমার হয়েই আমি এতকাল এই হাত বহন করেছি। এঁকেছি। তোমার যে-তুলি আমি সেই তুলিতেই এঁকেছি এই নারীকে। ক্যানভাসে আমি এক উপাসনা মূর্ত করেছি। (হক, ১৯৯১: ৩১৯)

এখানে নিঃসঙ্গ শিল্পী তীব্র বেদনার্ত হয়ে যায়, অসহায় অনুভব করে, আকুতি প্রকাশ করে এবং যুবকের হাত তার হাতে মিলিয়ে দিতে চায়। শিল্প-প্রতিভা বড় কথা নয়, বয়সও বড় কথা নয়, বরং পুরুষের হাত হলো প্রধান। পুরুষের হাত সবসময়

নারীকে নির্মাণ করে, নারীকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে, নারীকে প্রেম দেয়। ফলে নারী নিজে বিকশিত নয়, নারীকে পুরুষের প্রচেষ্টায় নির্মিত হতে হয়।

> দেখুন, দেখুন, শিল্পী নয়, পুরুষের চোখ দিয়ে একবার দেখুন– কেমন তরুণ দেহ, মসৃণ শরীর, শরীরের ভাঁজগুলো– দাঁড়াও, যাবে না লজ্জা কিসের? তোমার লজ্জা তো সব ছবি হয়ে আছে– শিগগীরই প্রদর্শিত হবে, বাংলার মানুষ দেখবে। আঁচলটা ফেলে দাও– কাঁধ কেমন আশ্চর্য গোল, মাংস কি কোমল, যৌবনের উষ্ণ তাপ, দীর্ঘ আঙুল, চোখে জ্যোছনাটিও দেখুন, বুকের পাহাড় ভেঙ্গে নাভি থেকে কেমন উপুড় হয়ে স্থির হয়ে আছে। (হক, ১৯৯১: ৩২১)

এখানে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে দেখা যায় পুরুষ শিল্পী যুবতীর যে ন্যুড এঁকেছে, যুবক সেই ন্যুড প্রদর্শনেরও কথা বলে, যা প্রৌঢ়ের সংলাপেও পাওয়া যায়। অর্থাৎ নারী প্রদর্শিত হবে। নারী যখন এক্সিবিউটেড বা প্রদর্শিত হয় তখন সংলাপের মধ্যে যে ভাষ্য তৈরি হয় সেটা হলো নারী প্রদর্শনযোগ্য এবং সমাজের একটা পুরুষালী চোখ আছে নারীকে দেখার বা নারীকে দেখার একটা চাহিদা আছে। এখানে পুরুষের নগ্ন রূপ কিন্তু আঁকা হচ্ছে না, নারীর নগ্ন রূপ আঁকা হচ্ছে। নারীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেখতে চাওয়ার যে পুরুষালী আকাঙ্ক্ষা এটা ব্যক্ত হচ্ছে। নারী প্রদর্শনযোগ্য, বিবেচনাযোগ্য নয়। প্রদর্শন করছে পুরুষ, ফলে কর্তা পুরুষ আর কর্ম হচ্ছে নারী। নিষ্ক্রিয় নারী, সক্রিয় পুরুষ। ভয়ারিজম অর্থাৎ একটা চৌর্য দৃষ্টিপাত আছে, পুরুষ একান্তে নারীকে নগ্ন আঁকে, আবার সমাজের একটা প্রকাশ্য দৃষ্টিপাত আছে। প্রকাশ্য দৃষ্টিপাত এবং চৌর্য দৃষ্টিপাত উভয় দৃষ্টিপাতেই শেষপর্যন্ত গ্রেফতার হয় নারীর শরীর।

> [কারণ] প্রতিটি কিংবদন্তি ইঙ্গিত করে একটি কর্তার প্রতি, যে তার আশা ও ভয়গুলোকে বিস্তীর্ণ ক'রে দেয় এক সীমাতিক্রমণতার আকাশের দিকে। নারীরা নিজেদের কর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করে না এবং সেজন্যে তারা এমন কোনো পুরুষপুরাণ সৃষ্টি করেনি, যাতে প্রতিফলিত হয়েছে তাদের পরিকল্পনা; তাদের নিজেদের কোনো ধর্ম বা কবিতা নেই : তারা আজো পুরুষের স্বপ্নের ভেতর দিয়ে স্বপ্ন দেখে [...] [এবং] পুরুষ ও নারী– এ-ধারণা দুটির অপ্রতিসাম্যকে প্রকাশ করা হয়েছে কামপুরাণগুলোর একপাক্ষিক গঠনের মধ্য দিয়ে। আমরা অনেক সময় নারী বোঝানোর জন্যে বলি 'লিঙ্গ'; নারী হচ্ছে মাংস, মাংসের সুখ ও বিপদ। নারীর জন্যে পুরুষও যে লিঙ্গ ও মাংস, তা কখনও ঘোষিত হয়নি, কেননা ঘোষণা করার কেউ নেই। বিশ্বের উপস্থাপন, বিশ্বের মতোই, পুরুষেরই কাজ; তারা একে বর্ণনা করে নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে, যাকে তারা গুলিয়ে ফেলে ধ্রুবসত্যের সাথে। [...] এস্কিলুস, আরিস্ততল, হিপোক্রেতিস ঘোষণা করেছিলেন অলিম্পাসে যেমন পৃথিবীতেও তেমনি পুরুষ-নীতিই সত্যিকারভাবে সৃষ্টিশীল : এর থেকে এসেছে গঠন, সংখ্যা, গতি;

> দিমিতারের প্রযত্নে শস্য জন্মে ও সংখ্যায় বাড়ে, কিন্তু শস্যের উদ্ভব ও সত্যিকার অস্তিত্বের মূলে আছে জিউস; নারীর উর্বরতাকে গণ্য করা হয় শুধু এক অতিক্রয় গুণ হিসেবে। নারী হচ্ছে মাটি, আর পুরুষ বীজ; নারী জল এবং পুরুষ অগ্নি। (বোভোয়ার, ২০১৯: ১২৬-১২৭)

(৫)

নারীর উপর, নারীর শরীরের উপর পুরুষের ক্রমাগত বিজয়ের চেষ্টা "নারীর স্তর একেবারেই স্তব্ধ করেনি" (আহমেদ, ২০১৪: ১৬০)। যুবতীর আত্ম-উন্মোচনকারী সংলাপ– "আমি প্রেম চেয়েছি জীবনে, আমি প্রেম চেয়েছি শিল্পে; এতদিন মনে করতাম প্রেম এসে যায়; আজ আমি জানলাম যে কোন প্রেমই কিন্তু আমাদের অর্জন করে নিতে হয়। সে অর্জন ধরে রাখতে হয় জেগে থেকে"। (হক, ১৯৯১: ৩৩৪) এখানে যুবতীর স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা প্রকাশ পায়।

> [এখানে] নারী [যুবতী] বিভক্ত হয়ে পড়ে নিজের বিরুদ্ধে; সে কামনা করে দৃঢ় আলিঙ্গন, যা তাকে পরিণত করবে শিউরে-ওঠা বস্তুতে, তবে পুরুষতা ও বল এমন অসহ্য নিরোধক, যা ক্ষুণ্ন করে নারীকে। তার ত্বক ও তার হাত উভয় স্থানেই থাকে তার অনুভূতি, এবং এক এলাকার চাহিদা আংশিকভাবে অন্যটির চাহিদার বিরোধী। যতোটা সম্ভব সে আপোষ করে; সে একটি পৌরুষসম্পন্ন পুরুষের কাছে নিজেকে দান করে। (বোভোয়ার, ২০১৯: ২৩০)

যুবতীর এই প্রেম যাচনা মানবের অন্তর্গত একটা চিরাচরিত প্রেমের ধারণা ব্যক্ত করে। যুবতী পুরুষের প্রতি ভোগের জন্য নয় বরং প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, যে প্রেম শিল্পেও সক্রিয় থাকে।

> *প্রেম* শব্দটি উভয় লিঙ্গের কাছে কোনোক্রমেই একই অর্থ বোঝায় না, এবং এটাই তাদের মধ্যে মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির একটি কারণ, যা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে মতানৈক্য। [...] প্রেম সম্পর্কে পুরুষ ও নারীর ধারণার মধ্যে যে-ভিন্নতা দেখা যায়, তাতে প্রতিফলিত হয় তাদের পরিস্থিতির ভিন্নতা। [...] প্রেম হচ্ছে নারীর ওপর চেপে থাকা এক ভয়ঙ্কর মর্মস্পর্শী অভিশাপ, যে-নারী বন্দী হয়ে আছে এক নারীর জগতে, যে বিকলাঙ্গ নারী (বোভোয়ার, ২০১৯: ৩৫৬-৩৬৬)

নাটকের মধ্যে যুবতীর একটা প্রেমিকা সত্তা রয়েছে, যে প্রেম তার মনকে পরিচালিত করে। 'প্রেমই কিন্তু আমাদের অর্জন করে নিতে হয়' তার মানে শিল্পী হওয়ার ব্যাপারটি মানুষের সাধনার ব্যাপার। তাকে কর্মী হতে হবে, কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে নির্মাণ করে নিতে হবে। জীবনকে তবুও যে পরিত্যাগ করা যায় না– এটা মানুষের

সবচেয়ে বড় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কাজের মধ্য দিয়ে আত্মসত্তার প্রসারণ সম্ভব। জীবনে আশা এবং হতাশার চুম্বকরেখা আছে। জীবনের মধ্যেই জীবন বিরোধী উপাদান থাকে। সেই বিরোধিতাই জীবনের মুক্তির সম্ভাবনাকে রহিত করে। কিন্তু এখানে একটা ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেখা যায়। যেখানে কাজের মধ্য দিয়ে জীবনকে পুনরুৎপাদন করবার আশা ব্যক্ত হয়। "আমাকেও এখন বেরিয়ে আজ নিঃস্বের অন্ধকারে খুঁজে নিতে হবে সামান্য এই জীবনের অসামান্য দুই অর্জন; আমার স্বামীর প্রেমে সংসারের ব্যঞ্জনে লবন, আপনার প্রতি প্রেমে আমাদের শিল্পের ভূবন" (হক, ১৯৯১: ৩৩৪)। নারীর জীবনের অসামান্য অর্জন দুজন পুরুষ। একটা তার সংসার, আরেকটা তার শিল্প। পুরুষের মাধ্যম ব্যতীত, ঘটকালী ব্যতীত নারীর জীবনের অর্জন হয় না। কারণ "পুরুষ সৃষ্টি করেছে নারীর জন্যে এক এলাকা– জীবনের রাজ্য, সীমাবদ্ধতার রাজ্য– নারীকে সেখানে বন্দী ক'রে রাখার জন্যে"(বোভোয়ার, ২০১৯: ৭২)। যদিও যুবতীর সংলাপে দেখা যায়, যেকোন কিছু নিজেকে কর্মের মধ্য দিয়ে অর্জন করে নিতে হয়। নারীর এক অসাধারণ কর্মী সত্তার প্রকাশ ঘটে। সে আবার স্বামীর সংসার আর শিক্ষকের প্রতি প্রেমের মধ্য দিয়ে ভূবন রঞ্জিত করতে চায়। "পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতা নারীকে উৎসর্গ করেছে সতীত্বের কাছে; এবং কম-বেশি প্রকাশ্যেই স্বীকার ক'রে নিয়েছে পুরুষের কামস্বাধীনতা, আর নারীকে আবদ্ধ করা হয়েছে বিবাহে"(বোভোয়ার, ২০১৯: ২২৭)। ফলে শেষ পর্যন্ত পুরুষের মাধ্যমে অর্জন আয়ত্ত করতে চেয়েছে। এখানে পরোক্ষভাবে হলেও একদিকে সে কর্মী সত্তা, অন্যদিকে অন্তর্গতভাবে তার একটা নির্ভরশীল সত্তারও প্রকাশ পাওয়া যায়।

প্রৌঢ়ের আর্তনাত–

> তুমি কি জানো তোমার ভেতরে যে এখন আছে সে আমি এবং আমার?
> তোমার নগ্নতার অপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যে নিঃশ্বাস সে আমার এবং আমার?
> তুমি, তুমি, রক্তমাংসে যে তুমি, আমি সেই তোমাকে চাই।
> আমার ক্যানভাস হোক অমর, তোমার নদীতে আমি মরতে চাই।
>
> (হক, ১৯৯১: ৩৩৯)

এখানে প্রৌঢ়ের একটা পুরুষালী অহং প্রকাশ পায়।

> [যেখানে] সে চায় আরো বেশি কিছু : চায় তার প্রেমিকা হবে সুন্দর। নারীসৌন্দর্যের আদর্শ রূপ পরিবর্তনশীল, তবে কিছু দাবি থাকে অপরিবর্তিত; নারীর নিয়তিই যেহেতু কারো মালিকানায় থাকা, তাই তার দেহের থাকতে হয় বস্তুর জড় ও নিষ্ক্রিয় গুণ। কর্মের জন্যে শারীরিক যোগ্যতার মধ্যে থাকে পৌরুষদীপ্ত সৌন্দর্য, থাকে

> শক্তিতে, ক্ষিপ্রতায়, নমনীয়তায়; এটা হচ্ছে সে-সীমাতিক্রমণতার প্রকাশ, যা সপ্রাণ ক'রে তোলে শরীরকে। (বোভোয়ার, ২০১৯: ১৩৮)

নারীর মন, নারীর সত্তা, নারীর মনোজগৎ বা অন্তর্জগৎ পুরুষের আওতায় আছে বলে সে দাবী করছে। যার ফলে এক পরাধীন নারী চিত্রিত হয়। নাট্যিক উদ্দেশ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ঘটনা বিন্যাসের দিক থেকে পরিণতির যে বিশেষ মূল্য আছে, সেদিক থেকে দেখা যায় যে, প্রৌঢ়ের এই হাহাকার এবং আর্তনাদ দীপ্ত উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নারীর অন্তরজগৎও তার (প্রৌঢ়ের) বলে সে মনে করছে। ফলে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য– নারীর অন্তর্জগৎও পুরুষের অধীনে। 'আমার ক্যানভাস হোক অমর'– এখানে প্রৌঢ় শিল্পী হিসেবে নারীকে বিষয় করে তার যে শিল্প সৃজন, ঐ শিল্পের জয়জয়কার করে। কর্তা শক্তি হিসেবে সৃষ্টিশীল পুরুষেরা নারীকে শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করে সেই শিল্পের জয়গান করে, যেখানে নারী বস্তুতে পরিণত হয়। "বিশ্বসংস্কৃতির অজগ্র পুরাণেও পুরুষই সৃষ্টিশীল [...] ধর্ম থেকে শুরু করে শিল্পকলা, বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রে [...] নারী সৃষ্টি করতে পারে না, নারী হতে পারে পুরুষের লেখার বা শিল্পকর্মের একটা মডেল" (আজাদ, ২০০২: ৩১৩–৩৩২)। ফলে নারী স্রষ্টা নয়, সৃষ্ট বিষয়বস্তু মাত্র।

এ নাটকে নারী শব্দের প্রয়োগ সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে উল্লেখ করলে দেখা যায়, প্রৌঢ় নারী শব্দ সতের বার উচ্চারণ করেছে, এর মধ্যে এগারোবারই নারী 'ভোগ্য' অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। নাট্যকার যুবকের সংলাপের মধ্য দিয়ে তুচ্ছভাবে নারীর শরীরের বর্ণনা তুলে ধরার পাশাপাশি যুবকের দুইটি সংলাপে নারী বা যুবতী শব্দ আঠারো বার উচ্চারিত হয় যেখানে যুবক নারীকে দেখেছে স্ত্রী হিসেবে, ভবিষ্যৎ সন্তানের মা হিসেবে, মাতৃভূমি হিসেবে, বাংলাদেশের প্রতীক হিসেবে এবং তার সঙ্গী হিসেবে, যে সঙ্গী সাথে থাকলে জীবন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। "নারীত্বের ধারণাটি যেহেতু কৃত্রিমভাবে তৈরি হয়েছে প্রথা ও ফ্যাশন দিয়ে, তাই এটা বাইর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয় প্রতিটি নারীর ওপর" (বোভোয়ার, ২০১৯: ৩৭৩-৩৭৪)। এ নাটকে নারীবাচক শব্দ বা ব্যক্তি হিসেবে বা মানুষ হিসেবে নারী প্রায় নারীর শরীরের বিশেষ প্রত্যঙ্গের নামে সম্বোধিত হয়েছে। যুবতীর দুইটি সংলাপে এগারো বার নারী শব্দের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর, নিজের স্বপ্নকে ব্যক্ত করতে চেয়েছে। জীবনে-শিল্পে যুবতী ব্যক্তি হিসেবে কর্তা হতে চেয়েছে। নাটকে দুই পুরুষ চরিত্রের সংলাপে বিভিন্ন ভাবে নারীর শরীর চিত্রিত হয়। দুই পুরুষ চরিত্রের দ্বন্দ্ব যেন এ নারীর শরীরকে ঘিরেই। এমনকি যুবতী চলে যাবার পরও প্রৌঢ় অস্থির হয়ে পড়ে, একটা শরীর হারিয়ে ফেলার আকুতি প্রকাশ পায় তার সংলাপে। *ঈর্ষা* নাটকে যুবতী এক দিকে সংসারের বাধ্যবাধকতায় আটকা আছে আবার শিল্প সৃষ্টির তাড়নাও তার মধ্যে লক্ষণীয় বিষয়। এ ধরনের একটা দ্বান্দ্বিক মনস্তত্ত্ব দ্বারা প্রতিরূপায়িত

হয় যুবতী চরিত্রটি। শেষপর্যন্ত যে দ্রোহ, বলিষ্ঠতা, স্বাধীন চিন্তাশক্তিতে নারীত্বের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়, পুরুষের প্রতি তার নির্ভরশীলতা রূপায়িত হওয়ার ফলে সেই ধ্বনি শেষপর্যন্ত ক্ষীণকায় হয়ে যায়। নাট্যকারের বিষয়বস্তুর গভীরতা ও নাট্যভাষার তীব্রতা এই নাটককে আরো সম্পর্কমুখী, জীবনমুখী করে তুলেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন (২০০২)। *নারী*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

আহমেদ, সৈয়দ জামিল (১৯৯৫)। *হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*। ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

আহমেদ, সৈয়দ জামিল (২০১৪)। Ahmed, Syed Jamil (২০১৪). "Designs of living in the contemporary theatre of Bangladesh", In: Ashis Sengupta (ed), *Mapping south asia through contemporary theatre: Essays on the theatres of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal and Sri Lanka*. UK: Palgrave Macmillan

প্লামউড, বাল (১৯৯৩)। Plumwood, val (1993). *Feminism and the Mastery of Nature*. Routledge: London

বোভোয়ার, সিমোন দ্য (২০১৯)। *দ্বিতীয় লিঙ্গ*। (হুমায়ুন আজাদ, অনু.)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী

স্পিভাক, গায়ত্রী চক্রবর্তী (১৯৯০)। Spivak, G. C. (1990) "The Intervention Interviw", in: *The Post-colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues*, Sarah Harasym (ed.). New York: Routledge.

হক, সৈয়দ শামসুল (১৯৯১)। *ঈর্ষা*। কাব্যনাট্য সংগ্রহ (পৃ: ২৮৩–৩৪০)। ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ প্রকাশন